গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

সুখ দুঃখের মিশ্র স্মৃতি রেখে চলে যাচ্ছে ২০১৯। ভারত তথা সারা বিশ্বের মানুষ এখন মেতে আছেন ২০২০ কে স্বাগত জানাতে। ঠিক এই বর্ষান্তরের সন্ধিক্ষণেই প্রকাশিত হতে চলেছে গুঞ্জনের এই সংখ্যাটি। নতুন বছর মানে নতুন ভাবনা, নতুন আশা, নতুন উদ্দম। সাহিত্যের জগতেও নেই তার ব্যাতিক্রম। জানুয়ারীতেই তো আসছে কলকাতা বইমেলা। পাণ্ডুলিপির তরফ থেকে প্রকাশিত তিনটি বই ওখানে থাকবে, আশা রাখি ঐ বইগুলো সবাইকেই কিছু নতুনত্বের স্বাদ দিতে পারবে।

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ১, সংখ্যা ৭
ডিসেম্বর ২০১৯

অণু গল্প সংখ্যা

কলম হাতে

সংযুক্তা চ্যাটার্জী, সুভাষ মুখার্জী, নাহার আলম, দীপঙ্কর সরকার, প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য, ডাঃ অমিত চৌধুরী এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ
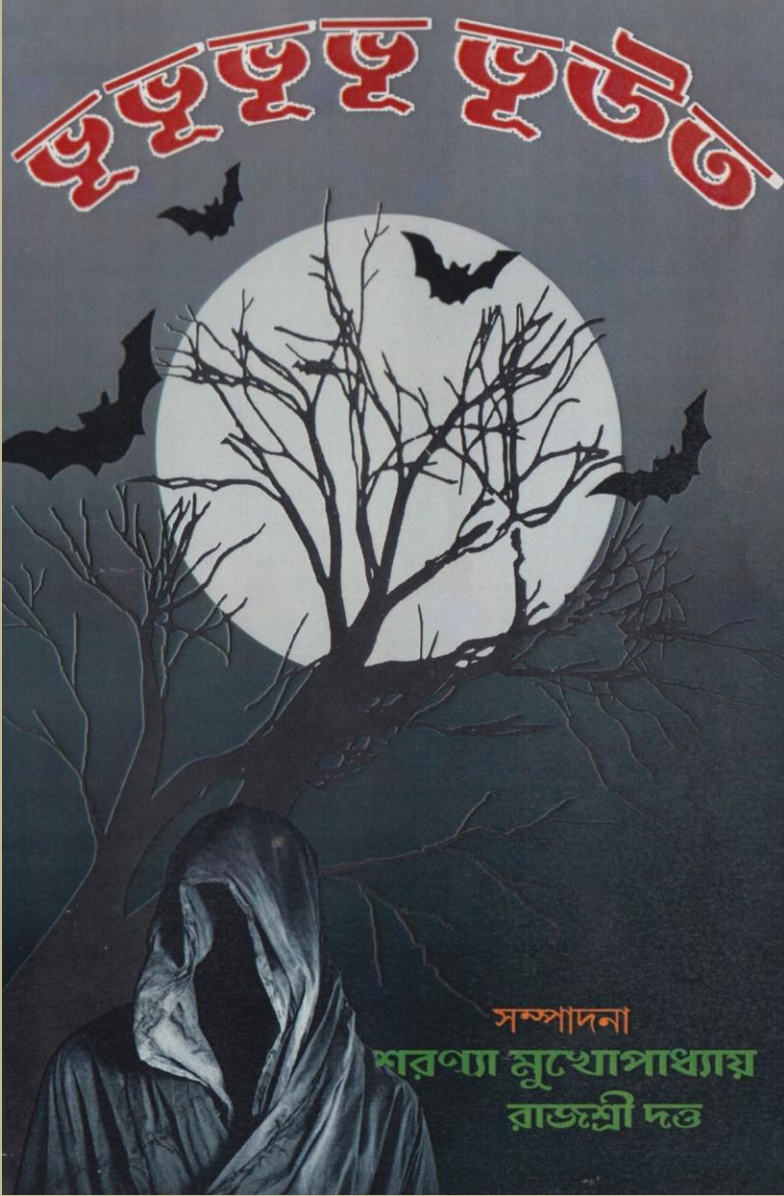
মুল্যঃ ৮০ টাকা [এখন অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। ডেলিভারি চার্জ লাগবে।]

লিঙ্ক (Just copy and paste to your browser):
https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

পায়ে পায়ে

কথায় বলে, সময় আপন গতিতে বয়ে চলে আগামী অজানার অন্বেষণে। আমরাও এই সময়ের একনিষ্ঠ অনুগামীর ন্যায় এগিয়ে চলেছি। আনন্দের বিষয় এই যে, 'গুঞ্জন'ও এই একই পথের পথিক। পাণ্ডুলিপির হাত ধরে সেই হারিয়ে যাওয়া 'গুঞ্জন' আজ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছে। ইতিমধ্যে আমাদের প্রকাশিত প্রথম ছোটদের (জন্য) গল্প সংকলন 'ভূ ভূ ভূ ভূ ভূউত' খুদে পাঠকদের কাছে বেশ সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। আশা করছি এর দ্বিতীয় সংকলনও খুব শীঘ্র আনা সম্ভব হবে। এছাড়াও খুব শীঘ্রই রূপায়িত হতে চলেছে পাণ্ডুলিপির আরও দু'টি প্রকল্প। আশা করি, শীঘ্রই পাণ্ডুলিপির গুণী লেখক-লেখিকাদের সাথে নিয়ে আমরা আরও নতুন নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনায় ব্রতী হতে পারব। তাঁদের লেখার উৎকর্ষতা এবং তাঁদের সহযোগিতা আমাদের এই এগিয়ে চলার পাথেয়।

বিগত ছয় মাসে 'গুঞ্জন'এ আমরা পেয়েছি অনেক কবিতা, বড়গল্প ও ছোটগল্পের লেখনি সম্ভার; সাথে সাথে ছিল ধারাবাহিক গল্পের অবাধ রেশ। তবে আজকের ব্যস্ত জীবনে, সকলেরই পড়ার সময় বড় কম। তাই 'গুঞ্জন'এর এই ডিসেম্বর সংখ্যাটি আমরা পূর্বেই 'অণুগল্প সংখ্যা' হিসাবে ঘোষণা করেছিলাম। অতেব, কম কথায় শিক্ষামূলক জীবন ভাবনাকে সাহিত্যের আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে, বর্ষ শেষে সুনিপুণ অণু অণু কলমের ছোঁয়ায় 'গুঞ্জন'এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিলাম কিছু অণুগল্পের সূক্ষ্ম চিন্তনের আলোড়ন। ■

বিনীতা

রাজশ্রী দত্ত – সম্পাদিকা, গুঞ্জন

কলম হাতে

কলম হাতে

দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জানুয়ারি সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ২৬শে ডিসেম্বর, ২০১৯।

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

(৬)

খুব সকালে হাঁটা শুরু করেছি, এখানে সূর্য দেরি করে ওঠে। আমাদের হাঁটাটা কেমন যেন একটা নেশায় পেয়ে গেছে। সকাল থেকে একটানা আট কিলোমিটার আমার প্রিয়জনদের সাথে নিয়ে চলে এলাম ডিনডোড়ি।

এখন সকাল সাড়ে আটটা, চা খেয়ে দাম দিতে গেলে দোকানদার কিছুতেই নেবেনা, অনেক বুঝিয়ে দুই কাপ চায়ের দাম দিলাম। এখনও অবধি মার্তণ্ড দেবের দেখা নেই। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে, তাই আমাদের হাঁটাটা হঠাৎ হঠাৎ থমকে যাচ্ছে। বৃষ্টি থামলে আমরা আবার চলা শুরু করলাম।

এই চলার মাঝে কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কখনও একাক্ষরি বীজমন্ত্র – আবার কখনও রেবা মন্ত্র জপ করে চলেছি। মিনিটে আঠারো বার শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে না গুনে জপ করাটাই অজপা জপ। আমি তাই করার চেষ্টা করে চলেছি, কতটুকু পারছি তা মা নর্মদাই জানেন।

বিশ্বকবির কথায় বলতে হয়ঃ

“আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি।

নমামি দেবী নর্মদে

তোমায় দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চাই নি।।
আমার সকল ভালবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাই নি।।”

সকাল দশটার সময় সূর্যের দেখা পেলাম। সাথে সাথেই সূর্যের তেজের প্রভাবে গরম হয়ে গেল পরিবেশ। একটি গাছের ছায়ায় বসে আছি সামনেই একটি স্কুলের দিদিমনি দিব্যানন্দজীকে প্রনাম করে পঞ্চাশ টাকা দিলেন চা খাওয়ার জন্যে। কিছুক্ষন পরে একটি অটোওয়ালা দিব্যানন্দজীকে বারোটা কলা দিয়ে গেল। বুঝলাম সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, মা সেটা ভোলেননি। পাশেই একটি ঝরনায় স্নান করে আমরা চারজন সেই কলার সদ্ব্যবহার করলাম। হেঁটেই চলেছি পথের আর শেষ নেই। আর পারছিনা, এখন দুপুর তিনটে। একটি প্রাইমারি স্কুলের বারান্দায় আজকের মত আসন পাতলাম। ফাঁকা মাঠের মধ্যে স্কুল, তাই যত বেলা পরে আসছে ঠাণ্ডা ততই বাড়ছে। দিব্যানন্দজী আর নতুন সঙ্গী নিরঞ্জন গ্রামের দিকে গেল রাত্রের ভোজনের ব্যবস্থা করতে। সন্ধ্যের মধ্যেই রান্না শেষ।

আটার গোলাকে পুরিয়ে একটি খাদ্যবস্তু তৈরি করে ফেললেন দিব্যানন্দজী, এর নাম বাটি। আমি না খেলেও বাকিরা সবাই খেয়ে নিল। এবার শোবার পালা, কিন্তু মশা! মনে হোল ওরাও আমাদের সাথে পরিক্রমা করছে... ■

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

দুঃস্বপ্নের রাতে আমরা কজন

স্বাগতা পাঠক

(৪)

ঘড়ির কাঁটা তখন দশটা বেজে পঁচিশ এর ঘর ছুঁয়েছে, আমরা গায়ে রেন কোট চাপিয়ে হাতে টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অর্ণব প্রমথেশ সবার পেছনে আমি আর অনুরাধা মাঝে আর আমাদের আগে পথ দেখিয়ে হাঁটছে অপূর্ব আর রাই।

একটা ঘাসে ভরা ইটের রাস্তা পেরিয়ে মিনিট খানেক হেঁটে আমরা নামলাম একটা মাঠের মধ্যে সেখানে প্রায় এক হাঁটু জল, আসে পাশে ঝিঝির ডাক আর ব্যাঙের গোঙানি, অনুভব করলাম অনুরাধা আমার হাতটা শক্ত করে চেপে আছে আর ও প্রায় ঠক ঠক করে কাঁপছে। আমি বললাম – হ্যাঁ রে অনু তুই তো ভয়ে কাঁপছিস! একটু ধমক দিয়ে অনু বলল – চুপ কর এই বৃষ্টি আর ঝোড়ো হওয়ার ঠান্ডাতে আমার কাঁপুনি ধরছে। সত্যি বৃষ্টির সাথে সাথে একটা ঝোড়ো হওয়া দিচ্ছে আর তাতেই বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। তবে কাঁপুনি দেওয়ার মতো নয়, বুঝলাম বেচারি একটু ভয় ও পাচ্ছে, কথা না বাড়িয়ে এক হাঁটু জল ভেঙে আমরা এগিয়ে গেলাম। অপূর্ব সামনে টর্চের আলো ফেলে আমাদের উদ্দেশ্যে বলল – ওই দেখ আমরা চলে এসেছি আমাদের

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

গন্তব্যে। সাথে সাথে আমরা সকলেও সেদিকে টর্চের আলো ফেললাম। দেখলাম, বেশ পুরনো একটা বাড়ি, পুরনো ধাঁচে গড়া, সেকেলে ইঁটগুলো যেন বড় বড় চোখ খুলে চেয়ে আছে, ওপরের প্লাস্টার অনেক আগেই ঝরেছে, কোথাও আবার দেওয়াল ফুঁরে গাছ গজিয়ে উঠেছে, বৃষ্টির জল তর তর করে বেয়ে পড়ছে ভাঙাচোড়া দেওয়ালের গা বেয়ে। তবে বেশ উঁচু এক হাঁটু জল হলেও দালানে জল ওঠেনি, সিঁড়ির কাছে গিয়ে অপূর্ব বলল সাবধানে পা ফেল, দু'টি সিঁড়ির ধাপ জলে ডুবেছে।

আমরা সকলে পা টিপে টিপে উঠলাম ভাঙা বাড়ির দালানে। আচমকা দেখি একটা বিরাট কালো ছায়া মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে ভেতরে প্রবেশ করার দরজা জুড়ে, আমি আর অনু তো প্রায় অক্কা যাব – চিৎকার করে আমরা নেমে পড়লাম জলে, অপূর্ব আমাদের আটকে বলল – ভয় পেও না, ও ভূত নয় মানুষ, আমার লোক। তারপর ওই কিম্ভুতের মুখে বুলি আসল, দাদা আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। অর্ণব আর প্রমথেশও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল, তাই আমাদের ভয় পাওয়াটা নিয়ে আর ব্যঙ্গ করেনি।

কিন্তু রাই আর অপূর্ব হেসে খুন, এর মধ্যে অপূর্বর ফোনটা বেজে উঠল, আমাদের চুপ করতে বলে, সে বলল – কাকার ফোন, ফোন ধরে অপূর্ব রাইএর কাকাকে বলল – এই বৃষ্টিতে আমরা আর ওই বাড়ি ফিরব না, কাল সকালে একেবারে ফিরব।

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

এবার আমরা ভেতরে ঢুকলাম, সামনেই একটা বড় ঘর সেটাও ভগ্ন-প্রায় তবে মাথার ওপর ছাদটা আছে বৃষ্টি ঠেকানোর মতো, কিন্তু বেশ ধুলোবালিময় আর এই ঘরে জানলাটা বেশ অনেকটা ভাঙা, বৃষ্টির জল ঢুকছে। সেই ঘর পার করে ওই কুচকুচে কালো পালোয়ান আমাদের নিয়ে গেল পরের ঘরটায়, সেখানে বেশ সুন্দর পরিপাটি করে মাদুর বিছানো আর জানলায় প্লাস্টিক দেওয়া জলের ঝাপটা আটকানোর জন্য। আর রাখা আছে একটা হ্যারিকেন।

অপূর্ব বলল – এটাই আমাদের আজ রাত কাটানোর জায়গা। আর এই পালোয়ান ধরণের লোকটা হল অপূর্বদের দোকানের হেল্পার, বিশু। ওর বড্ড সাহস, ওকে বলেই এই ঘর পরিষ্কার করিয়ে রাখা হয়েছে। আর ছেলেটি খুব বিশ্বস্ত কাউকে বলবে না যে আমরা এইখানে এসেছি। আমাদের সব গুছিয়ে দিয়ে বিশু অপূর্বকে সেলাম ঠুকে চলে গেল।

এই ঘরে দরজা থেকে দেখলাম পাশে আরো একটা ঘর আছে অপূর্বকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল – একটা না ভেতরে আছে আরও তিনটে বড় বড় ঘর, তবে এই বৃষ্টির রাতে এই ঘরটাই থাকার জন্য উপযুক্ত। অর্ণব বলল – কেমন একটা গন্ধ আসছে। অপূর্ব জানাল – কার্বলিক অ্যাসিড, সারা ঘরে ছড়ানো, এই বর্ষার রাতে এই ঝোপ জঙ্গলে তোমরা ভূতের দেখা না পেলেও, বিষাক্ত সাপের দেখা পাবে, তার হাত থেকেই বাঁচতে এই ঘরে

কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়েছে। পাশে রয়েছে কতগুলো ডিমের ট্রে মশার হাত থেকে বাঁচতে ওটা জ্বালাতে হবে। তবে এখনও পর্যন্ত মশা আমাদের আক্রমণ করেনি।

রেনকোটগুলো খুলে আমার ঘরের এক কোনায় রাখলাম, পায়ে কাদা লেগেছিল ওইগুলো ওই দালানের বারান্দা থেকে পা চুবিয়ে জলে ধুয়ে নিয়েছি, এবার আমরা একে একে চাটাইয়ের ওপর বসলাম আর মাঝখানে রাখলাম হ্যারিকেনটা। অর্ণব ওর ক্যামেরাটা বের করে সেটা কোথায় রাখবে জায়গা খুঁজতে লাগল, ভুল করে স্ট্যান্ডটা আনেনি। তবে ক্যামেরা রাখার জায়গা খুঁজে পেতে বেশি কষ্ট হলনা। আমাদের উল্টো দিকের দেওয়ালেই কিছু তাক করা ছিল। ধুলোয় ভরা একটা তাক একটা পলিথিন এর প্যাকেট দিয়ে মুছে, সে ওখানেই ক্যামেরাটা ভেতরের ঘরের দিকে মুখ করে বসিয়ে দিল।

এর পর গল্পে গল্পে প্রায় ঘণ্টা খানেক কেটে গেল, আমরা ঝিঁঝির ডাক আর ব্যাঙের গোঙানি ছাড়া কিছুই শুনতে পেলাম না। এখন বৃষ্টির বেগ কমেছে। বাকি সবার কথা জানি না, তবে ঘুমে আমার চোখগুলো জড়িয়ে আসতে চাইছিল। একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে, আমি সকলের কথা শুনছিলাম, কথা কানে আসছিল ঠিকই তবে কি বলছে কিছুই মাথামুন্ডু বুঝতে পারছিলাম না। কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার ঠিক নেই, হঠাৎ

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

ডান হাতে একটু ব্যাথা অনুভব করলাম, আর একটা ফিসফিস আওয়াজ আমার কানে আসল। ঠিক কেউ যেন আমাকে ডাকছে। কোনো রকমে চোখ খুলে দেখলাম অনুরাধা আমার হাতটা ওর সমস্ত গায়ের জোর দিয়ে চেপে ধরেছে, আর আমার কানে কানে বলছে – একবার বাঁ দিকের দরজার দিকে তাকা। হঠাৎ করে ঘুম ভাঙাতে আমার স্নায়ুগুলো ঠিক কাজ করছিল না, আমি অনুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিস্ফারিত চোখে ও কি যেন দেখছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করেই আমি তাকালাম, যা দেখলাম তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে একটা দুটো না চার চারটে নারী মূর্তি। তাদের মুখগুলো বিভৎস ভাবে পোড়া, আমাদের দিকে তাকিয়ে এক বিদঘুটে হাসি হাসছে। আমার গলা থেকে যেন আওয়াজ বেরোতে চাইল না। ঘরের মাঝের হ্যারিকেনের আলো ঝিমিয়ে এসেছে, মনে হয় তেল শেষ হতে যাচ্ছে। সেই নিভন্ত আলোতে আমি আমার বাকি সাথীদের মুখগুলোও দেখলাম। সকলেই ঘুমন্ত, কিন্তু ওদের মুখগুলোও বিশ্রী ভাবে পোড়া। আর দেখে মনে হচ্ছে না, ওরা কেউ জীবিত আছে, এবার আমি অনুরাধার দিকে তাকালাম, না আমি সহ্য করতে পারছি না ওর মুখটাও কি ভয়ানক ভাবে পুড়েছে। প্রচণ্ড এক চিৎকার দিয়ে আমি ধড়ফড়িয়ে উঠলাম, আমার চিৎকারে বাকি

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

সকলের ঘুম ভেঙে গেছে। শুধু অনুরাধা ঘুমোচ্ছে। আমার স্বপ্নের কথা ওদের বললাম রাই আমার চোখে মুখে জল দিয়ে দিল। ভোর হয়ে গেছে। আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে, বৃষ্টিটাও আর নেই। তবে কাল সারাটা রাত আমরা ঘুমিয়ে মরেছি, ভূতও আমাদের বিরক্ত করতে আসেনি। লোকজন ওঠার আগেই আমাদের এই পোড়ো বাড়ি থেকে বেরোতে হবে অপূর্ব বলল। সেই মতো আমরা আমাদের জিনিস পত্র নিয়ে রেডি হব, এর মধ্যে আমাদের খেয়াল হল অনুরাধা এখনও ঘুমোচ্ছে, এত কথাবার্তার মধ্যেও ওর ঘুম ভাঙল না, রাই ওকে ডাকতে গিয়ে অনুভব করল, প্রচণ্ড জ্বরে ওর গা পুড়ে যাচ্ছে। কোনো রকমে ওকে আমরা অপূর্বদের বাড়িতে আনলাম, তখন সকল ছটা বাজে, ভেজা জামা-কাপড় বদল করে ওকে অপূর্বর একটা পাজামা পাঞ্জাবী পরিয়ে শুইয়ে দিলাম। তারপর আমরা একে একে সবাই ফ্রেশ হলাম। ততক্ষণে ওদের বাড়ির রান্নার দিদি এসে গেছে, অনুরাধাকে গরম চা খাইয়ে ওষুধ দিলাম। রাইএর বাড়িতে খবর দিলাম অনুর জ্বর এসেছে। ওর শরীরটা একটু ভালো হলে আমরা বিকেলে রাইদের বাড়ি যাব, আর অপূর্বও জোরাজুরি করল দুপুরে খেয়ে যাবার জন্য।

আমরা বাড়িতেও ফোন করে জানিয়ে দিলাম আজ আমরা ফিরছি না, অনুর জ্বর কমলে তবেই ফিরব।

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

দুইবার ওষুধ খাবার পর অনু একটু সুস্থ হল। তারপর ওর মুখে আমরা যা শুনলাম তাতে আমাদের রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার জোগাড়। আমরা ভাবছিলাম বৃষ্টিতে ভিজে অনুরাধার জ্বর, তবে তা না কাল রাতে সে ওই বাড়িতে ভয়ানক কিছু দেখে জ্ঞান হারায়। আর আমি যে স্বপ্ন দেখে ভয়ে ঘুম থেকে উঠেছিলাম সেই একই ঘটনার সাক্ষী অনুও। আমাদের সকলের মুখে ভয় ও উৎকণ্ঠার ছাপ। একজন স্বপ্ন দেখতে পারে, তাই বলে অন্য একজন ভিন্ন ব্যক্তি একই স্বপ্ন হুবহু দেখবে কি করে!

এবার হঠাৎ প্রমথেশ বলে উঠল – অর্ণব তোর ক্যামেরাটা একবার দেখ। সারা রাত আমাদের কোনো ভৌতিক ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়নি বলে, আমরা আর কেউ ক্যামেরাতে কিছু বন্দী হবে এটা আশা করিনি। অর্ণব এবার বেশ ভয় ও উত্তেজনা মিশ্রিত মুখ নিয়ে আমাদের দিকে তাকাল, তারপর ক্যামেরাটা চালু করল, আমরা সকলেই ভয়ার্ত চোখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম ক্যামেরাতে।

ফুটেজ শুরু হলো, ঘণ্টা দুয়েক আমাদের গল্প আড্ডা, এবং কথা বলতে বলতে সব থেকে আগে আমার ঘুমিয়ে পড়া, তারপর একে একে রাই ও প্রমথেশ। তারও পরে অপূর্ব এবং সবশেষে অর্ণব ঘুমিয়ে পড়ল। অনুরাধা ও আমার কাঁধে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু হঠাৎ

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

কিসের একটা শব্দ... ও জেগে উঠে এদিক সেদিক তাকায় কিন্তু কিছু দেখতে পারে না। তারপর আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর কেটে যায় আরও আধ ঘণ্টা, এখন আমরা সবাই প্রায় ঘুমন্ত। হঠাৎ বাঁ দিকের দরজার কাছে একটা ধোঁয়াটে সাদা মূর্তির আবির্ভাব হয় আস্তে আস্তে। ক্যামেরার ফুটেজ দেখতে দেখতে আমাদের সকলের অবস্থা প্রায় শুকিয়ে কাঠ, আমরা একে অপরের মুখ চাওয়াচাই করছি। এর মধ্যে ঘরের ঝিমিয়ে পড়া হ্যারিকেনএর আলো আরও বেশি ঝিমিয়ে পড়েছে। তারপর যা দেখলাম... একে একে ঘরের মধ্যে উদয় হল চারটে ছায়া মূর্তি এবং প্রত্যেকে আমাদের ঘুমন্ত শরীরের উপর দিয়ে ভেসে যেতে থাকল।

এবার লক্ষ্য করলাম ধীরে ধীরে আমাদের সকলের মুখের আদল বদলে যেতে থাকল – প্রথমে রাই, তারপর অপূর্ব, তারপর প্রমথেশের... তারপর দেখলাম অনুরাধা আমার কানে কানে কি বলছে, আর আমার হাত শক্ত করে ধরে আছে। আমার সেই সকাল বেলার স্বপ্নকে আমি যেন ক্যামেরার ফুটেজে দেখতে পেলাম। শেষে যখন আমি অনুর দিকে তাকালাম, তখন অনুর মুখটাও বিচ্ছিরি ভাবে বদলে গেছে, কিন্তু ক্যামেরার ফুটেজে আমি দেখলাম ওর সাথে সাথে আমার মুখটাও পুরে বিশ্রী রকম দেখতে লাগছে। নিজেকে দেখে চিনতেই পারলাম না। আর ঠিক তখনই আমি আর অনু একে অপরকে দেখে আমাদের চেতনা

হারিয়ে ফেলি। আর তারপর ওই চারটি নারী মূর্তি একে একে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পুরো ক্যামেরার ফুটেজ দেখার পর আমরা প্রত্যেকে স্তম্ভিত, অনুরাধা জ্বরের শরীর নিয়েও দরদর করে ঘামছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে অপূর্ব বলল – আমি এতদিন এইগুলোকে গুজব ভাবতাম, তবে আজ বুঝলাম সত্যিই ঐখানে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব আছে। অপূর্ব অর্ণবকে বলল ক্যামেরার ফুটেজটা কপি করে ওর (অপূর্বর) কম্পিটারের দিয়ে যেতে।

ফুটেজ কপি করতে গিয়ে আমরা এবার অবাক হলাম। ক্যামেরার মেমারিতে কোনো ফুটেজ নেই, সব ব্ল্যাঙ্ক। এ কি করে সম্ভব! আমরা যে এখনই দেখলাম! এবার ক্যামেরার মধ্যেও আমরা ফুটেজটা খুঁজে পেলাম না।

অতঃপর আমরা বুঝলাম যে সেই রাতে আমরা যে ঘটনার সাক্ষী হয়েছি সেটা আমাদের মাঝেই থাকবে – আমরা চাইলেও কাউকে বলতে পারব না। আর বললেও প্রমাণ কিছু দেখাতে পারব না।

সেইবারের মতো আমরা ফিরে এলাম টাকি থেকে। এর পর আমরা আর কোনোদিন কোনো ভৌতিক অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়ার কথা ভাবিনি। শুধু সেই রাতের কথা ভেবে আজও শরীরের সব রোমকূপ সতেজ হয়ে ওঠে। আমরা বেঁচে আছি অক্ষত, কিন্তু সেই রাতটা আমাদের কাছে ছিল একটা দুঃস্বপ্নের রাত। যা হয়তো আমরা ছয়জন কোনো দিন ভুলতে পারবো না... ...সমাপ্ত ■

মেবার ভ্রমণ

আজমীর পর্ব

মালা মুখার্জী

জেমস টডের লেখা অ্যানালস্ অ্যাণ্ড অ্যান্টিক অব রাজস্থান কজন পড়েছেন জানি না, তবে পাঠকগণের অনেকেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজকাহিনী পড়েছেন। আর সেই রাজকাহিনীর মুখ্য বিষয় ছিল সূর্য্যবংশীয় রাজা শিলাদিত্যের বংশধরদের কাহিনী, যাতে ক্রমানুসারে রাণা সঙ্ঘ থেকে রাণা প্রতাপ এবং আরও অনেক রাজার কাহিনী এমনকি প্রচলিত লোকগাথাও স্থান পেয়েছে। সেই রাজকাহিনীর স্মৃতিবিজরিত রাজস্থানের মেবার অঞ্চলে এবার চলেছি। এতক্ষণ যোধপুর, বিকানির শহর দর্শন করলাম – অর্থাৎ মারওয়াড় অঞ্চল ভ্রমণ করলাম, এবারের গন্তব্য চিতোরগড়। অবশ্য আজমীর থেকে চিতোরগড় যাওয়াই সুবিধাজনক লেগেছিল আমার। তাই প্রথমেই থাকবে আজমীর পর্বের বিবরণ।

দিল্লি থেকে রাজস্থান ভ্রমণের একটাই সুবিধা, দু'চারটে করে স্পটে ব্রেক নিয়ে নিয়ে ঘোরা যায়। আমরাও তাই করেছি। তাই রাজস্থান ভ্রমণের দ্বিতীয়ার্ধে মেবার ভ্রমণ ঠিক করেই

রেখেছিলাম। এবার অবশ্য আগেরবারের মতো ক্রিসমাসের আগে ছুটি পাইনি, তাই ক্রিসমাস আর নববর্ষের সপ্তাহেই বেরতে হল। আজমীর, চিতোর আর উদয়পুর যেহেতু একই রুটে পড়ে, তাই আজমীর শতাব্দি করে আগে আজমীর যাওয়াই ঠিক করলাম। শতাব্দি সকাল ছ'টায় ছাড়ে নিউ দিল্লি স্টেশন থেকে। তাই এবারেও মা-মেয়েতে কাকভোরে বের হলাম। শতাব্দি অবশ্য লেট করে না খুব প্রবলেম না হলে, আর শীতকালে উত্তর ভারতের ভয়ঙ্কর কুয়াশা পশ্চিম ভারতকে গ্রাস করতে পারে না। তাই বেলা একটার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম আজমীরে। এখানে আর. টি. ডি. সি.র হোটেলের নাম খাদিম, স্টেশন থেকে দুরে নয়, তথাপি অটো সত্তর টাকা নিল।

খাদিমে পৌঁছেই একটু ফ্রেশ হয়ে একটা গাড়ি ঠিক করে বেরলাম পুষ্কর ভ্রমণে। কথিত আছে পুষ্কর হল একমাত্র তীর্থ যেখানে জগতপিতা ব্রহ্মার মন্দির আছে। পুষ্কর ছাড়া আর কোথাও এমন নেই। বিভিন্ন অভিশাপে নাকি ব্রহ্মার পুজোর প্রচলন জগতে নেই, তবুও এই স্থানটি ব্যতিক্রম।

এই স্থানে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা যজ্ঞ করেন, তাঁর পত্নী সাবিত্রীর আসতে দেরি দেখে গায়ত্রী নাম্নি এক সাধারণ কন্যাকে বিবাহ করে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন; কারণ যজ্ঞ করতে দম্পতির প্রয়োজন। সাবিত্রী ক্রোধান্বিতা হয়ে অভিশাপ দিলে ব্রহ্মার পুজো বন্ধ হয়। আর এই গায়ত্রীই হলেন বেদমাতা, পরবর্তী যুগে সরস্বতীর রূপ, এঁর নামেই গায়ত্রী মন্ত্র।

অবশ্য এই কাহিনীর এক ভিন্নরূপও বর্তমান। শিবমহাপুরাণ মতে ব্রহ্মার পুজো বন্ধ করেন স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং পঞ্চানন ব্রহ্মাকে চতুরাননও করেন তিনিই। অবশ্য এসব প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

শ্বেতপাথরে নির্মিত মন্দিরের বহু আগেই গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে হল। চারিপাশে দোকানপাট, সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার হল যে অনেক দোকানে অস্ত্র বিক্রি হচ্ছে, তলোয়ার থেকে ফায়ার আর্মস। একটা দোকান থেকে পুজোর সামগ্রী কিনে, জুতো রেখে আবার হাঁটা দিলাম। *অহম ব্রহ্মাস্মি* মন্ত্র লাউড স্পিকারে ধ্বনিত হচ্ছে। লম্বা লাইন মন্দিরে, একেবারে নীচের সিঁড়ি থেকে। প্রচুর সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হয়, অবশ্য অনেক লাইন থাকায় একটানা সিঁড়ি ভাঙ্গতে হল না।

মন্দিরের গর্ভগৃহে চতুরাননের মূর্তি, পাশে মাতা গায়ত্রী। ব্রহ্মদেবের তিনটি মুখ সামনে থেকে দেখতে পেলেও, চতুর্থ বা পিছনেরটি দেখতে মন্দিরের পিছনে রাখা একটি আয়নার সাহায্য নিতে হয়। মন্দির দেখা হয়ে গেলে বিখ্যাত পুষ্কর লেক দর্শন, আমরা সাবিত্রী ঘাট দিয়ে লেকে নামলাম। পুষ্করের ঘাট কাশী বা হরিদ্বারকে মনে করিয়ে দেয়। এখানেও শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান ইত্যাদি কার্য্য চলছে।

ঘাট আর ব্রহ্মা মন্দিরের পাশাপাশি প্রচুর দোকান, ধূপের, জামাকাপড়ের ও হাতের কাজের। খুব সস্তা দরদাম করলে

রাজস্থানী ক্যাপ, ব্যাগ ইত্যাদি কিনতে পারবেন। অনতিদূরেই উটের সারি দাঁড়িয়ে। যাঁরা জয়শলমীর যাননি তখনও, ওখানেই বালিয়াড়িতে উটের সফর করছেন। আমরা অবশ্য চললাম আজমীরের দিকে, আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হলো আন্না সাগর লেক।

চিত্র পরিচয়ঃ পুষ্করের হ্রদ ও ঘাট...

পাহাড় ঘেরা এই লেকের কাছে যখন গাড়ী করে পৌঁছলাম, তখন আকাশে গেরুয়া রঙ ধরেছে। আকাশ আর জল এক রঙে মিলেমিশে একাকার, দূরে কালো মেঘে গেরুয়া রঙ প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে শ্বেতপাথরের প্যাভিলিয়নগুলির ওপর। যাযাবর পাখিরা আন্নাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে রাতের ঠিকানায়। দরবেশদের ক্যালোয়াতি গানের সুরে সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু মিলেমিশে একাকার। এমনই এক দরবেশ যোধা-আকবর ছবির গান ধরলেন, *খাজা মেরে খাজা, দিলমে সমা যা*। অপূর্ব স্পিরিচুয়াল

ফিলিংসের মধ্য দিয়েই শুনতে লাগলাম আন্নাসাগরের ইতিহাস। সম্রাট পৃথ্বিরাজ চৌহানের পিতামহ এই হ্রদ বানিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান এখানে গার্ডেন আর প্যাভিলিয়নগুলি বানান, ওই প্যাভিলিয়নে দাঁড়িয়েই দেখা যায় সূর্যাস্তের নৈসর্গিক দৃশ্য। ফোটোগ্রাফির জন্য আইডাল জায়গা, তবে বেশীক্ষণ সময় দিতে পারলাম না, আজমীর শরিফ দরগায় ভীড় হয়ে যাবে, ড্রাইভার জানিয়ে দিলেন ।

চিত্র পরিচয়ঃ আন্নাসাগরের সূর্যাস্ত – আজমীর...

পুরানো শহরের ট্রাফিকে গোঁত্তা খেতে খেতে চললাম দরগার রাস্তায়। চারিদিকে থিকথিক করছে লোকজন, ড্রাইভার বিরক্ত, এসব জায়গায় ভোরে যেতে হয়, বা আমরা যদি না যাই তো কি এমন হবে? তবে আমি ওসব কথা শোনার বান্দি নই। এক জায়গায় চৌরাস্তার মোড়ে এসে ড্রাইভার ঘোষণা করলেন, “আর আমার গাড়ি যাবে না

ম্যাডাম, অটো বা রিক্সা নিন। শুনলেন না তো, পস্তাবেন, আপনার মাতাজী পারবেনই না।”

নিলাম অটো, চললাম দরগায়। সাদা আর সবুজের আলো ঝলমলে দরগার রাস্তার সাথে যে কোনো মন্দিরের রাস্তার হবহু মিল, সস্তার দোকান, ধর্মশালা আর ভিখারি। অটো গেটের সামনেই দাঁড় করাল। এক জায়গায় জুতো চটি রেখে, ফুল আর চাদর কিনে চললাম ভিতরে। মাথা ঢাকতে হোল স্কার্ফ বা ওড়না দিয়ে। ভিতর থেকে ভেসে আসছে আজানের ডাক ।

এক জন স্থানীয় লোক গাইড সেজে গেল, এই দরগা খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির নামে নির্মিত, নির্মাতা হলেন মহম্মদ বিন তুঘলক, এনার নাম অল্পবিস্তর সবাই জানে। এই দরগাকে খাজা গরীব নওয়াজও বলে । যুগে যুগে বাদশা আর সুলতানরা দান করেছেন, নিজাম গেট তারই নিদর্শন। হায়দ্রাবাদের সপ্তম নিজাম মির ওসমান আলি খান এটির নির্মান করেন। দরগার মেইন গেট তৈরী করেন মাহমুদ খিলজি ।

তবে যে গল্প আমায় বেশী টানল তা হলো নিজাম ভিস্তির গল্প। একটি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে গাইড এমন এক গল্প বলল, যা বুঝি আরব্য রজনীকেও হার মানাবে। “জানেন ম্যাডাম জী, ইনি ছিলেন আড়াই দিনের বাদশা।”

নিজাম ভিস্তির গল্প বড়ই রোমাঞ্চকর। জল ভরার কাজে নিযুক্ত নিজাম ভিস্তি থাকতেন উত্তর ভারতে। সম্রাট হুমায়ুনকে গঙ্গাপার করে পলায়ন করতে সাহায্য করা এই

মানুষটিকে সম্রাট মনচাহা ইনাম দিতে চান। নিজাম আড়াই দিনের বাদশা হতে চান। হুমায়ুন তাঁর খোয়াইশ পূর্ণ করেন। এই আড়াই দিনের বাদশা রাজা হয়েই তিনি এক আশ্চর্য কাজ করলেন। দেশ হতে সমস্ত সোনা-রুপোর সিক্কা তুলে নিয়ে চামড়ার সিক্কার প্রচলন করেন। এই আড়াই দিন দিনরাত এক করে উটের চামড়ার সিক্কা তৈরি হত। সারা দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। আড়াই দিন বাদে রাজমুকুট খুলে আসল রাজার পায়ে তা নিবেদন করে নিজাম ভিস্তি জানান যে – যুদ্ধে জর্জরিত ভারতের অর্থনীতিকে তাগড়া বানাতেই তার এমন পরিকল্পনা। নিজাম ভিস্তি বা নিজাম সিক্কার এই ডিমনিটাইজেশন তৎকালীন ভারতকে কতটা উপকৃত করেছিল জানি না, তবে ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রথম ডিমনিটাইজেশনের রূপকারের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে এসব গল্প শুনতে বেশ মজা লাগল।

গাইডের কথা শুনতে শুনতে নামাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আবার শুরু হলো কাওয়ালি গান। কিছুক্ষণ গান শোনার পর দেখলাম প্রসাদ রান্নার বিশাল হাণ্ডি, যাতে সাধ্যমতো দান করতে হয়। অনেকে চাল ডালের প্যাকেটও দিয়েছেন দেখলাম।

ঝর্ণা, তালাও আর শ্বেতপাথরের পিলারওলা প্যাভিলিয়ন পেরিয়ে দরগায় ঢুকে পুজো চড়ালাম। বেশ ভীড়, তবে তারই মধ্যে দর্শন হোল। এবার ফেরার পালা, রাস্তার দুধারের দোকান থেকে অনেক কিছুই কিনতে ইচ্ছে হবে।

চিত্র পরিচয়ঃ আজমীরের দরগা...

এরপর পুনরায় ই-রিক্সা করে চৌরাস্তায় এলাম। ড্রাইভার খুশী নয়, ওর নাকি বেজায় দেরি হয়েছে।

হোটেল খাদিম অবশ্য খুব দুরে নয়, শীঘ্রই দেখতে পেলাম আলোকমালায় সজ্জিত হোটেল খাদিমকে। আজ বড়দিন মানে ক্রিসমাস, হোটেলের লনে ক্রিসমাস ট্রি সাজানো। আজকের স্পেশাল মেনু বিরিয়ানি আর চিকেন বা পনির কষা। আমরা তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে, হোটেলের জি এসটি আর খাবারের দাম মিটিয়ে দুগ্ধফেননিভ বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম। কাল আবার ছ'টা কুড়িতে চিতোরের বাস ছাড়বে...

...ক্রমশ ■

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

ছায়া-কায়া

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৯)

দু'দিন পর ব্রজবাবু জয়ের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। ভোলাকে সুধীরবাবু আগেই সব বুঝিয়ে বলে রেখেছিলেন। তাই ব্রজবাবুকে সামনের ঘরে বসিয়ে, সে জয়কে খবর দিল যে ফুটবল দ্যা চ্যাম্পের নতুন খেলোয়াড় প্রকাশ একজন ভদ্রলোককে পাঠিয়েছেন। ব্রজবাবু জয়ের ঘরে যাওয়ার অনুমতি পেলেন ভোলাদা মারফৎ।

জয়ের ঘরে ঢুকতেই অনেকগুলো পেন্টিঙ্গ দেখতে পেলেন ব্রজবাবু। সব কটি ছবি ছিল অসম্পূর্ণ ও ঝাপসা পেন্সিলে স্কেচ করা। তবে ছবিগুলো অসম্পূর্ণ আর ঝাপসা হলেও বেশ জীবন্ত, যেন কিছু বলতে চাইছে বা কিছু খুঁজছে। খাটের সামনে টেবিলটায় ছড়ানো রয়েছে অজস্র পেন্সিল। রঙের মধ্যে মাত্র দুটি রঙই চোখে পড়ল – সাদা ও কালো। টেবিলের পাশে হুইল চেয়ারে বসে আছে জয়। ব্রজনাথকে দেখে সে বলল — আপনাকে প্রকাশ পাঠিয়েছে? প্রকাশ খুব ভাল খেলে। আমি ওকে বলেছিলাম এবারের ফাইনাল ম্যাচের পর নিউ সিলেকশানে ওকে অবশ্যই নেব। তার আগে যে এমন একটা দুর্ঘটনা আমার সাথে ঘটবে তা তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তবে প্রকাশ যে সিলেক্ট হয়েছে তাতে আমি খুব খুশি। প্রকাশ নিজে এই খবরটা না দিতে এসে আপনাকে দিয়ে পাঠাল? আর আপনার পরিচয়টা যদি সবিস্তারে বলেন!

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

-- আমি ব্রজনাথ রায়চৌধুরী। প্রকাশ এখন কলকাতার বাইরে, ওর কিছু ডকুমেন্টস আপনার কাছে আছে, সেগুলো শীঘ্র চাই। তাই আমাকে পাঠিয়েছে, আমি ওর কাকা। প্রকাশ ফিরে এসে আপনার সাথে দেখা করবে। পেপারগুলো যদি আজই দেন খুব উপকৃত হই।

— হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেবো। কিন্তু একটা অসুবিধা আছে আজ হয়তো দিতে পারবনা। কারণ এই ব্যাপারগুলো আমার স্ত্রী দেখত। এখন আমারা আর একসাথে থাকিনা। তাই আপনাকে আমার স্ত্রীর বর্তমান ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি, আপনি ওখান থেকে নিয়ে নেবেন।

— সেকি! আমি তো জানাতাম আপনাদের খুব মিল। তবে এমন কেন হল?

ব্রজবাবুর অযাচিত কৌতূহলে জয় যেন কিছুটা অসন্তুষ্ট হল। সে কিছুটা রেগে বলল — "আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আপনার কোন প্রশ্ন থাকতে পারেন না।" এই বলে, সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে দেওয়ালে ঝুলানো একটা আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল।

ব্রজবাবু কথাটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — "আপনি কি আর কোনদিন খেলতে পারবেন না?"

— বোধহয় না। মানুষের নিজের ওপর থেকে যখন নিজের ক্ষমতা চলে যায়, তখন দাসত্বই তার জীবন হয়ে ওঠে। আর তখন আপনকেও পর করে দিতে হয়।

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

— আপনার যন্ত্রণাটা কোথায়, আমি বুঝি। তবে সব শেষ থেকেই তো আবার নতুন শুরু হয় — তাই নয় কি? আপনিও সেটাই করার চেষ্টা করুন।

— নাহ্, সে আর হওয়ার উপায় নেই। আমাদের দলের খবর বলুন।

— বলছি, বাইরে ভালো হাওয়া দিচ্ছে বাকি কথা চলুন না বাইরে গিয়ে বলি।

— আমার বাইরে যাওয়া বারণ। বাকি কথা ঘরেই বলুন। আর তাছাড়া আমার বেশি কথা বলতে ভালো লাগে না। তাই...

— আরে ঠিক আছে, আসলে বয়েস হচ্ছে তো, তাই হয়তো মনের মতো লোক পেলে একটু বেশি বকবক করে ফেলি। আপনি লিখে দিন ঠিকানাটা।

এই বলে, ব্রজবাবু ঘরের চারদিকটা শান্ত দৃষ্টিতে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন। সারা ঘরে কি রকম একটা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব। যেমন অনেকদিন একটানা বৃষ্টি হলে চারদিকটা স্যাঁতস্যাঁত করে ঠিক তেমন। আর দিনের বেলা সব কটা জানলা এমন ভাবে বন্ধ করা আছে যেন শহরের কোন গোপনীয়তা এখানে লুকানো আছে। কোথাও সূর্যালোকের ক্ষীণ প্রবেশেরও অধিকার নেই। এ যেন যক্ষপুরীর মতোই ঘুটঘুটে আঁধারে ঢাকা। ঘরের আলোটাও খুব কমজোর হয়ে পড়েছে এই ঘরের অন্ধকারকে দূর করার শেষ প্রয়াসে।

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

ইতিমধ্যে জয় রঞ্জনার ফোন নম্বর আর তার মামার বাড়ির ঠিকানাটা লিখে ব্রজবাবুর হাতে তুলে দিল। তারপরেই হঠাৎ ফ্যাসফ্যাসে গলায় সে বলল — আপনি এবার রওনা দিন। বাড়ি যেতে অনেকটা সময় লাগবে আপনার। আমার কিছু পারসোনাল কাজ আছে।

ব্রজবাবু ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই সজোরে দরজাটা ভেতরদিক থেকে বন্ধ হয়ে গেল। ভিতর আর বাইরের পরিবেশটা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা বাইরে বেড়িয়ে ব্রজবাবু বেশ অনুভব করলেন। তিনি আজ রাতটা গোপনে জয়ের বাড়িতে থেকেই কাটবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু দীনুবাবুর জরুরী তলবে ফিরে যেতে হল। ...ক্রমশ ■

নষ্ট নারীত্বের ইতিকথা

সংযুক্তা চ্যাটার্জী

(ধারাবাহিক ২)

–"কেন ফিরে এলে তুমি? মহাবীর, পৌরুষের অহঙ্কারে গর্বিত দেবব্রত তোমায় অপহরণ করেছিলেন। তারপরও আশা কর আমি তোমায় গ্রহণ করব?" আজ নারী অবাক বিস্ময়ে দেখলেন প্রিয়তমের নগ্ন পুরুষত্ব। একেই কি তিনি অন্তরের নিভৃতে স্থান দিয়েছিলেন!

-"কেন?" অজান্তে প্রশ্ন করে ফেলেন প্রথমা।

-"কেন? এখনও বোধগম্য হয়নি তোমার! নষ্ট নারী তুমি। পতিতা। আর আমার যোগ্য নও।"

-"আমি নষ্ট?" মৃত্যুও শ্রেয় ছিল বুঝি।

-"নিশ্চিতরূপে। তাছাড়া আমি বিস্মৃত হতে পারি না, আমি একজন ভূস্বামী পুত্র। নগরীর উত্তরাধিকারী। নগরের জনগন তোমায় মান্যতা দেবে না। ফল স্বরূপ আমার অধিকারও প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। এ হবে মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতা। পূর্বে তুমি ছিলে ছোট নগরীর উত্তরাধিকারিনী। আজ সে নগরী অন্যের অধিকারে। তাই তোমাকে গ্রহণ আমার পক্ষে অসম্ভব।" অতএব এক্ষেত্রেও ব্যবসা। লাভ ক্ষতির তুল্যমূল্য বিচার।

ভ্রম

-"কিন্তু আমি যে অন্তঃসত্ত্বা!"

-"সে দায়িত্ব আমার নয়। যে তোমায় অপহরণ করেছে, দায়িত্ব তার।"

পৃথিবীও বুঝি তার আহ্নিকগতি থেকে বিচ্যুত হলো অনুক্ষণের জন্য।

তিন পুত্রীর পিতা জ্যেষ্ঠাকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষিত করেছেন। ভুল করেছেন তিনি। অন্যায় করেছেন। এই সমাজ নারী পুরুষের সমঅধিকার অস্বীকার করে। যে কন্যাকে তিনি এত স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, সে তার অপব্যবহার করেছে। সমস্ত জানা স্বত্ত্বেও অনৈতিক সম্পর্কে মত্ত হয়েছে। কন্যার সেই অন্যায়ের ফল স্বরূপ তিনি তাঁর নগরী হারিয়েছেন। তাই কন্যাকে ক্ষমা তিনি করবেন না। এই ছিল পিতার অভিমত।

(৭)

-"না। তিনি নেই। মালয় দেশে গেছেন। কিন্তু আমাদের জন্যে একটি নির্দেশ দিয়ে গেছেন। বোধ হয় সে নির্দেশ আপনার কারণেই।" দেবব্রতর নিবাসের প্রতিহার বলতে থাকে।

এখন আত্মসন্মান জলাঞ্জলি দিয়ে শেষ প্রচেষ্টা করছে সে। নিজের অভুমিষ্ঠ সন্তানের জন্য।প্রেমিক তাকে অস্বীকার করেছে। পিতা তাকে স্থান দেয়নি। এখন আর তার উপায় নেই। একটি দ্বারই বুঝি বাকি আছে। সে দ্বার তার শত্রুর, যে তার নষ্ট জীবনের জন্য দায়ী। দায়িত্ব তাঁকে নিতেই হবে।

-"কি নির্দেশ?" প্রশ্ন করে প্রথমা।

-"কোনো নারীকে যেন এই প্রাসাদে নতুন করে স্থান দেওয়া না হয়।" প্রতিহার ফিরে যায় নিজ স্থানে। সমস্ত আশা শেষ। একজন বুঝলেনও না কোন পর্বতপ্রমাণ অভিমানে এই নির্দেশ আর একজনের। একটি সভার কয়েকটি প্রহর একটি হৃদয়কে কিভাবে রক্তাক্ত করেছে!

অব্যক্ত ভালোবাসা এবং অভিমান বুঝি পরস্পরের পরিপূরক!

(৮)

আজ সেই দিবস। মালয় জয়ের বিজয়োৎসব। হাজারে হাজারে মানুষের জমায়েত। আসমুদ্র হিমাচলের সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমাগম হয়েছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই বড় নগরীর বশ্যতা স্বীকার করেছেন। কখনো যুদ্ধের সাহায্যে। কখনো বা চতুরতার দ্বারা। কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কের সাহায্য তিনি আর কখনো নেননি। বহুবার প্রস্তাব পেয়েছেন কিন্তু স্বীকার করেননি। আজও তিনি অবিবাহিত। কেন? সকলে মনে করে, তিনি মনেপ্রাণে যুদ্ধব্যবসায়ী হওয়ায় সংসারধর্ম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সত্য কারণ কেউ জানে না। হয়তো একজন মনের গভীরে অনুধাবন করেছিল! কিন্তু সে কোথায়? কালের গর্ভে বুঝি হারিয়ে গেছে! সে পরশ পাথরের দেখা কি আর পাওয়া যাবে, যার স্পর্শে লৌহকঠিন হৃদয় গলন্ত স্বর্ণে পরিবর্তিত হয়? সময়ই এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তরদাতা।

ভ্রম

(৯)

বিজয়োৎসব শুরু হয়েছে। মানুষের কোলাহলে কোনো কিছুই শ্রুতিগোচর হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী দেবব্রত এখনো পৌঁছননি। এ উৎসব যুদ্ধ উন্মাদনার উৎসব। নারী জাতির অংশগ্রহণ নৈব নৈব চ। তারা অন্তঃপুরের বাসিন্দা। এই উৎসবে তারা অপাংক্তেয়।

এর মধ্যে বিভিন্ন দ্বাররক্ষক এবং নিরাপত্তাকর্মীগণ এক ব্যক্তিকে বারংবার বাধা দিচ্ছে। পরীক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে তিনি পুরুষ। কিন্তু চলন-বলন, হাব-ভাবে নারীর আভাস। কে এই ব্যক্তি? সভার একেবারে প্রথম দিকের সংরক্ষিত স্থানের উপবেশনের নিদর্শনপত্র আছে তাঁর কাছে। কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সন্দেহ নেই। কিন্তু কে?

সুনির্দিষ্ট সময়ে দেবব্রতর আগমন ঘোষণা হয়। কোলাহল তুঙ্গে ওঠে। সকলেই দেবব্রতর দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট। একই সঙ্গে রক্ষীগণের ব্যস্ততাও তুঙ্গে ওঠে, এই বিপুল জন সমাহার পরিচালনা করতে। ফলতঃ এই নারীসুলভ পুরুষের প্রতি আর কারুর লক্ষ্য থাকে না। সে ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে এগিয়ে যায় মঞ্চের পার্শ্ববর্তীস্থানে, দেবব্রতর আগমন পথে। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই স্থানে। সে জানে নিজ অভিষ্ঠ। কার্যপ্রণালী।

ভ্রম

হঠাৎ এক বিশালাকায় শ্বেতহস্তীর বৃংহনে কেঁপে ওঠে সভা। ধীর গতিতে চলমান এক পর্বত। পৃষ্ঠে আসীন আজকের সভার প্রধান ব্যক্তি।

দেবব্রত।

পিছনের আর একটি হস্তী থেকে প্রতিহার পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকে। কাড়া নাকাড়া বাজতে থাকে। সুগন্ধি সিঞ্চিত করা হতে থাকে অবিরাম। পথের দুপাশে সৈনিকগণ নিজেদের যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করতে থাকে।

বৈভব এবং ক্ষমতার চরম নিদর্শন।

বিনা আয়াসে বিপক্ষের মত কিভাবে পরিবর্তন করতে হয়, সেনানায়ক বিলক্ষণ জানেন। শ্বেতহস্তী মঞ্চের পাশে এসে স্থির হয়। অবতরণ করেন তিনি। মঞ্চের ঠিক সম্মুখে এসে কেমন এক অচেনা অস্বস্তি অনুভব করেন। কেউ যেন তাঁকে অবলোকন করছে! তাঁর পরিচ্ছদ অতিক্রম করে, তাঁর চর্মদেহ অতিক্রম করে, একেবারে তাঁর অন্তরস্থল পর্যন্ত।

কে? কম্পিত বক্ষে ঘুরে তাকান তিনি। তখনই দেখতে পান তাকে।

একটি মানুষ। ওষ্ঠে স্মিত হাসি। হাত দুটি বুকের কাছে জড় করা। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চপার্শ্বে। কিছু দূর থেকে চেনা অচেনার দোলাচলে দুলতে থাকেন দেবব্রত। শেষ পর্যন্ত চুম্বকের ন্যায় আকর্ষিত একজোড়া

চোখ। জগৎ বিস্মৃত হলেন তিনি। চিনতে পারলেন পুরুষ। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে চিনলেন নিজের প্রেয়সীকে। পর্বতপ্রমাণ অভিমান এক নিমিষে চূর্ণবিচূর্ণ হল। এতদিন পরে! কোথায় ছিলে তুমি? কি হয়েছিল? এই স্থলে এলে কি করে?

না এসব কিছুই বলতে পারেন না তিনি। পৃথিবী স্থির হয়ে গেছে। পার্শ্ববর্তী কোলাহল স্তব্ধ।

মহাবিশ্বে শুধু দুটি মানুষ। একটি পুরুষ আর একটি... আর একটিও পুরুষ। এই সভায় প্রবেশের নিমিত্ত নিজের নারীত্ব বিসর্জন দিয়েছে যে নারী। কিভাবে বিসর্জন দিয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই। হয়তো চিকিৎসা বিজ্ঞান সাহায্য করেছে! অথবা দেবতা, দানব বা যক্ষের কৃপা। কেই বা সে সংবাদ রাখে!

এ স্থলে নারীর প্রবেশাধিকার নেই। দাম্ভিক পুরুষ ভুলে যায় নারীতেই তার জন্ম, নারীতেই তার প্রজন্ম। নারীতেই তার বন্ধন। আর নারীতেই মুক্তি।

সেই মুক্তিই দিতে এসেছে সে। প্রতিশোধ নিতে এসেছে। নিজের অভূমিষ্ঠ সন্তানের হত্যার প্রতিশোধ।

নিস্পলক দেবব্রত। স্তব্ধ প্রথমা।

-"এসেছি।" প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে প্রথমা। যেন বহুযুগ ধরে এই আগমন স্থির ছিল।

-"বড় বিলম্ব হলো!" যেন পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন দেবব্রত।

-"না। বিলম্ব কোথায়? সমস্ত প্রস্তুত করতে এটুকু সময় তো লাগবেই।"

-" তোমার পরিবর্তন যে চিত্তে বিশেষ পীড়া জাগাচ্ছে। কি প্রয়োজন ছিল?" সময়ের ব্যবধানে 'আপনি' সম্বোধনে বদল এসেছে।

-" আপনার নিকট পৌঁছনোর আর কোনো উপায় আমি পাইনি। এখন সঠিক সময় উপস্থিত। আপনার হেতু বিশেষ উপহার এনেছি। গ্রহণ করে আমায় বাধিত করুন।" উপহারের মোড়ক উন্মোচিত হয় দেবব্রতর সম্মুখে। একটি মাল্য। ইন্দিবর মাল্য।

শিহরিত হন দেবব্রত। নীল পদ্মের মাল্যের পশ্চাতের বিভীষিকার সহিত তিনি পরিচিত। এ বড় ভয়ঙ্কর অস্ত্র। বিধ্বংসী এর কার্য্য ক্ষমতা।

-"চল তবে এক সাথে প্রস্থান করি।" -স্মিত হাস্য দেখা যায় দেবব্রতর অধরে। "তবে এই স্থানে নয়। সমস্ত নগরীর প্রত্যেক রাজন্যবর্গ এখানে উপস্থিত। সকলের মৃত্যু ঘটলে সারা দেশ অনাথ হয়ে যাবে। মাৎস্যন্যায়ের সৃষ্টি হবে। ছারখার হয়ে যাবে আমাদের মাতৃভূমি। ভবিষ্যত প্রজন্ম তোমায় ক্ষমা করবে না। স্বর্গ মর্ত পাতাল কোথাও তোমার স্থান হবে না। আমার একমাত্র শত্রুর এ পরিণাম আমার অভিপ্রায় নয়।"

-" আপনি রাগত নন!" বিস্মিত প্রথমা।

ভ্রম

-"রাগত বা ভীত কোনোটাই নই। তোমার হাতে মৃত্যু, এ আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি। সম্ভবত এই সেই প্রাপ্তি, যার জন্য আমি প্রমত্তের ন্যায় আসমুদ্র হিমাচল ছুটে চলেছি। শ্রান্ত আমি। ভীষণ ক্লান্তও। তোমার বরমাল্য আমায় প্রদান কর।" গভীর আকুতি দেবব্রতর কণ্ঠে।

-"না। আমার সন্তানের মৃত্যুর হেতু আপনি। সঠিক বলেছেন আপনি। আমরা পারস্পরের একমাত্র শত্রু। এক মাতা হয়ে আমি আপনাকে ক্ষমা করতে পারিনা। তবু এই শেষ মুহূর্তে অস্বীকার করব না। আপনিই আমার একমাত্র প্রেম। এক অদ্ভুত পরস্পর বিরোধী সম্পর্ক আমাদের। অবর্ণনীয়। আর বিলম্ব নয়। আসুন দুজনে একত্রে যাত্রা করি। ভগবানের কাছে একটি প্রার্থনা। স্বর্গ হোক বা নরক, আমাদের যেন আর বিচ্ছিন্ন না করেন।"

##

গল্প এখানেই শেষ। গল্পকারের আরও একটু বক্তব্য আছে। রামায়ণের ঊর্মিলাই একমাত্র কাব্যের উপেক্ষিতা নয়। মহাভারতের অম্বার কথাও আমরা সবাই ভুলে যাই। তিনিই পরজন্মে শিখণ্ডি। মহামান্য ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ। মহাভারতের নিয়ন্ত্রতা। ...সমাপ্ত ■

অণু গল্প

শরণ্যা মুখোপাধ্যায়

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনির্বাণ বিশ্বাস

নাহার আলম

প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য

সুভাষ মুখার্জী

দীপঙ্কর সরকার

প্রবন্ধ

গল্পে গল্পে অণুগল্প

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

অণুগল্প কথাটির মধ্যেই একটি ক্ষুদ্র চেতনার ভাব ফুটে ওঠে। বর্তমান কালে, লেখক ও পাঠক উভয় শ্রেণীর মধ্যেই অণুগল্পের প্রতি ঝোঁক উত্তর-উত্তর বৃদ্ধি লাভ করছে। ব্যস্ত বর্তমান জীবনে এই অণুগল্পের স্বাদ কম-বেশি সকলেই গ্রহণ করছেন। তবে যদি মনে করা হয় এই অণুগল্পের সূচনা নিতান্তই একবিংশ শতকের দোরগোড়া থেকে, তবে তা চরম ভ্রান্তি বলেই গণ্য হবে। কয়েক দশক আগেই ইংরাজি সাহিত্যে মোপাসাঁর (Guy de Maupassant) কলমে মাইক্রো স্টোরি হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এই অণুগল্প। এতো গেল ইংরাজি সাহিত্যের ইতিকথা। এরপর বাংলা সাহিত্যের বড়গল্প- ছোটগল্পের ঠাঁসাঠাসি ভিড়ের মাঝে অণুগল্পও করে নিয়েছিল তার স্বতন্ত্র স্থান।

কথায় আছে, "সৃষ্টিকর্তার হাতেই থাকে সৃষ্টির সকল উপকরণ।" এমনি এক সৃষ্টিকর্তা হলেন ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল। তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে যথার্থ অণুগল্পের স্রষ্টা। তাঁর ক্ষুরধার জীবন ভাবনা ও গল্প

বিন্যাসের প্রতিস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "বনফুলের রচনায় বিষয়বস্তুর সঞ্চয় ভাণ্ডার চোখ এড়ানো সামগ্রী নিয়ে গড়া। বলা বাহুল্য তা দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা থেকে আহৃত।"

অণুগল্পের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাকে ছোটগল্পের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

১) অণুগল্পের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট থাকবে, যা সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী হতে হবে।

২) গল্পের বর্ণনা যাই হোক না কেন, সবশেষে পাঠক মনে একটি কৌতূহলের রেশ রেখে যাবে।

৩) অণুগল্পে শব্দসংখ্যা ১৫০ থেকে ৪৫০ এর মধ্যে হওয়াই যথার্থ।

৫) অণু গল্প হচ্ছে রং তুলি দিয়ে ছোট্ট ক্যানভাসে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক দৃশ্যকে সুষম বিন্যাসে ফুটিয়ে তোলা, যা ভাব গম্ভীর হবে এবং যার মধ্যে ধোঁয়াশায় মোড়া পূর্ণতা থাকবে।

৬) অণু গল্পে কাব্যময়তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

৭) এ গল্পে জীবনের খণ্ড ছবি ফুটে ওঠে।

৮) পাঠ করার সময়, অণু গল্প নিজের মতো করে অর্থ খুঁজে নিতে সাহায্য করে পাঠককে।

তাই সর্বোপরি বলা যায়, "শেষ হইয়াও হইল না শেষ" — এই অনুভূতি ছোটগল্পে যেমন অনিবার্য, ঠিক তেমনই অনুভূতিপূর্ণ করার ব্যাপার শতগুন অবধারিত থাকবে অণুগল্পে। ■

ভালোবাসা

শরণ্যা মুখোপাধ্যায়

আজ তেতাল্লিশ বছর হল। সেই কলেজের সময় থেকে এই জায়গাটায় এসে বসেন অনুরাধা। গঙ্গার এই ঘাটটায় লোকজন তেমন ভিড় করে না। কেবল শ্রাদ্ধের কাজ হয় মাঝে মাঝে। এখানে বড় শান্তি। নিজের ছোট্ট বুটিকটা সামলে রোজই এই সন্ধ্যার সময়টা এসে বসেন এখানে। নদীর ঢেউগুলোর ওঠাপড়া দেখতে দেখতে মনটা নরম হয়ে আসে। বাইশ বছর বয়সে দাঁতে দাঁত চেপে যে লড়াইটা তাঁকে কঠিন করে তুলেছিল, এই তেতাল্লিশ বছর যাবত সেই কাঠিন্যের মুখোশটা খসে যায় এই ফাগুণ মাসের নদীর পারের ঠাণ্ডা হাওয়ায়। আর ঠিক তখনই একটা কোকিল গেয়ে ওঠে, সামনের বটগাছটায়। ছানা হয়েছে নতুন, অনুরাধা দেখেছেন।

বিজয়ের কথা মনে পড়ে। এখনো। ছেষট্টি বছরের পাকাচুলো মাথাটার সাদা সিঁথিতে হাত বোলান অনুরাধা। নাহ, আর কাউকেই বিয়ে করে ওঠা হয়নি, বিজয় সম্পর্ক ভেঙে চলে যাবার পর। কেন এমন করেছিল বিজয়, বলেনি কখনো। অনেক অনুরোধের পর শুধু এটুকুই বলেছিল যে, যদি অনুরাধার এই টান সারাজীবন থাকে তাহলে শেষবেলায় একবার দেখা হবে। কত কথাই না বলেছিলেন তাঁরা – এই

গঙ্গার ধারে বসেই, একটাও মেলেনি। হাসলেন অনুরাধা, মেয়েরাই কি কেবল আঁকড়ে থাকে? তার কি একবারও মনে পড়েছে অনুরাধার কথা? কথা ছিল যতদূরেই তাঁরা যান না কেন, জীবনের শেষবেলায় একবার দেখা হবে, কিন্তু... কেউ কথা রাখেনি। শ্বাস ফেললেন অনুরাধা। আজও একটা কাজ হচ্ছে ওদিকের বেদীটায়। কৌতুহল হোল হঠাৎ, উঠে গিয়ে থমকালেন অনুরাধা... "আপনিই কি অনুরাধা দেবী...?" বছর তিরিশের একটি ছেলে। বিহ্বল হয়ে 'হ্যাঁ' বলাতে একটা হলুদাভ চিঠি দিল সে অনুরাধার হাতে। "আমার বাবার চিঠি।"

তোমার বাবা?

"সায়ক সেন।"

"ওনাকে ত ঠিক..."

"না, চেনেন না, তবে আমার আরেক বাবাকে চেনেন আপনি, বিজয় রক্ষিত।"

"?"

"আমার দুই বাবাই আমার মা ও বাবা। তখন স্বীকৃতি পাননি। এখন যা হয়েছে। আমার বাবার মুখে আপনার কথা শুনেছি, ছবিও দেখেছিলাম। বাবা বলেছিলেন তিনি চলে যাবার পর যেন এই ঘাটেই তাঁর কাজ হয়, বলেছিলেন এই ঘাটে আপনি থাকবেন। আপনার মুখখানা কিছু বদলায়নি বিশেষ, তাই চিনতে অসুবিধা হয়নি। এই চিঠিটা আপনাকে দিতে বলেছিলেন বাবা..."

শেষ বিকেলের কোকিলটা করুণস্বরে একবার ডাকল। ■

ফুলশয্যা

অনির্বাণ বিশ্বাস

রুমকির শরীরটা বেশ খারাপ। এই সময়ে তার পেটটা বেশ ব্যথা করে। তাই সন্ধ্যে থেকেই দোর বন্ধ করে শুয়ে ছিল। হঠাৎ দরজায় প্রচণ্ড জোর শব্দে সে বিরক্ত হয়ে বলল, "বললাম তো আজকে কাজ করবোনি। শরীরটা খুব খারাপ।"

– "একবারটি খোল রুমকি। বায়না নিয়ে ফেলেছি। খুব শাঁসাল পার্টি আর একদম মাতাল - তোর কোনো অসুবিধাই হবে না। শুধু একটু, তুই তো জানিস সবই।এবারটা করে দে...", বাইরে থেকে একজন বলল।

রুমকি একটু চিন্তা করে দরজা খুলে বলল, "পাঠিয়ে দে।" সে টয়লেট থেকে ফ্রেস হয়ে এসে দেখল একজন ধবধবে সাদা পাঞ্জাবী পরা বাবু বিছানায় বসে টলছে। সে বলল, "দেখো বাবু, বিছানায় বমি টমি কোরোনা আবার।" লোকটা মাথা নাড়িয়ে বলল, "এত নেশা আমার হয়নি এখনও। তুই আয় এদিকে তাড়াতাড়ি।"

বাইরে বিদ্যুতের ঝলকের সঙ্গে তীব্র বাজ পড়ল। রুমকির মনের মধ্যেও যেন তারই প্রভাবে বুকটা কেঁপে উঠল। সে দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে বলল, "আজ রাতে আর কাউকে পাঠাবেনা।" ছেলেটা চলে যেতেই দোর বন্ধ করে সে বাবুর কাছে এসে বলল,

হুঁশ-বেহুঁশ

"রতনদা আমায় চিনতে পারছ? আমি তোমার মণি। সেই আমাদের দেগঙ্গা গাঁয়ে....."

কথাটা শেষ হবার আগেই লোকটা চীৎকার করে বলে উঠল, "মণি! আমি মণি বলে একজনকেই চিনতাম। সে বেইমান। আমাদের নাবালক অবস্থায় বিয়ে হয়ে গেছিল। তারপর সে একটা ছেলের সঙ্গে পয়সার জন্য পালিয়ে যায়, আমাদের ফুলশয্যার দিন। আমি তাকে ঘেন্না করি।"

রুমকি তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "দেখ, আমায় দেখ, আমি তোমার..."

লোকটা নিজের মনেই বলতে থাকে, "তারপর থেকে আমি এখানে ওখানে অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াই। সবাইকে আমার মণিই লাগে। আমি তাদের উপর এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ি আর সেই অপূর্ণ বাসনা পূরণ করি।"

এই বলে সে রুমকির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রুমকি অনেকদিন পরে আবেশে চোখ বুজল।

সকালে দোর খোলার শব্দে রুমকির ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখল তার রতনদা চলে যাচ্ছে। পাশে অনেকগুলো টাকা পড়ে আছে। সে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বলল, "টাকাটা নিয়ে যাও।"

লোকটা একটু অবাক হয়ে বলল, "কার টাকা?"

– "কেন আপনার..." একটু বিকৃত করে হেসে রুমকি আবার বলে উঠল, "ফুলশয্যায় কি টাকা নেওয়া যায় বাবু?" ■

একপাটি চপ্পল

নাহার আলম

প্রতি পিতৃ বিয়োগ দিবসে ইলিয়াস তালুকদার সব শ্রেণীর দরিদ্রদের জন্যে উদারহস্ত। কিছু না কিছু দানের ব্যবস্থা রাখেন খাবারের পাশাপাশি। এলাহি কাণ্ড যাকে বলে। এ নিয়ে তাঁর বেশ সুনাম। সেদিনটা বেশ উৎসবমুখর হয়। আশপাশের প্রায় চল্লিশ গাঁয়ের গরীব, দুঃখী, পঙ্গু অসহায়েরা ছুটে আসে একবেলা ভাল খাবার আর সাথে কিছু পাবার আশাতেই। শিশু, কিশোর, যুবা ও বৃদ্ধ বয়েসীরাও স্বজনের কাঁধে চ্যাংদোলা করে হলেও আসে সেদিন। ইলিয়াস বাবু সেদিন স্বপ্নের সান্তাক্লজের মতো ইচ্ছাপূরণের দৈব কাণ্ডারি যেন!

ইলিয়াস বাবুর বাবা তিন বছর আগে বৃদ্ধাশ্রমে মারা যান ক্ষয়কাশে। তবে, সারা গাঁয়ে জনশ্রুতি আছে, ইলিয়াস বাবুর সেকেন্ড হোম লন্ডনে তাঁর বাবা ছিলেন অবকাশে। সূতিকাগারে মা। লেখাপড়া লবডঙ্কা। কোনোরকম টেনেটুনে তাও টুকি করে আট ক্লাস পাস। কিন্তু কূটকৌশলে সর্বসেরা! জুড়ি নেই তাঁর! পড়া ছেড়ে জমির দালালি দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। সে থেকে তাঁকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। একের পর এক গ্রামের সহজ সরল মানুষকে নানাভাবে ঠকিয়ে বুঝিয়ে নিজের নামে দলিল করা সেই ইলিয়াসই আজ বড় মহাজন। দানবীর, মহান জন-দরদি...

অপারগ

এমনি এক দিবসে চার পাঁচ বছরের এক আধ উলঙ্গ শিশুর কাছে সান্তাক্লজ সাজা ইলিয়াস বাবু জানতে চাইলেন, "কী চাও তুমি সোনা?"

– কাকু, আমি যা চামু তুমি তাই-ই দিবা তো আমারে? মাথাকে নব্বই ডিগ্রী ডান এঙ্গেলে কাত করেই বলল শিশুটি।

– হ, হ দিমুই তো। কও দেহি বাজান কী চাও?

শিশুটি বলল, "হোনো (শোনো) কাকু, আমার আন্দা (অন্ধ) লুলা বাবার একপাটি চপ্পল ছেদা (ছিদ্র) অইয়া (হয়ে) গেছেল। হেরপরে (তারপরে) আমি আমার একপাটি চপ্পল দাদি বুড়িরে দিয়া হেইডারে তালি মাইরা বাপেরে দিছি। বাপে তো চক্ষে (চোখে) দেহে না, এক ঠ্যাংগে আটতোও (হাঁটতেও) পারে না। আরেক ঠ্যাং তো বেইক্কা (খোঁড়া, বাঁকা) গেছে। অহন (এখন) আমি খালি পাওয়ে (পায়ে) দাদি বুড়ির লগে সারা গাও (গ্রাম) গুইরা গুইরা (ঘুরে ঘুরে) বিক্কা (ভিক্ষা) করতে করতে পাওয়ের (পায়ের) তলে ফোসকা পইরা লইছে। আটতো (হাঁটতে) পারি না। আমারে অহন খালি একপাটি চপ্পল দিলেই চলবো কাকু, দিবা?

শিশুটির কথায় এই প্রথম বুকটায় প্রচণ্ডরকম মোচড় দিল দানবীর ইলিয়াস বাবুর। এই একইরকম একপাটি চপ্পলই তার চাই। কত দামি দামি গিফট আনা আছে আজকের দিনের জন্যে, তার মাঝে এত ছোট এক চাওয়া কী করে পুরণ করবেন? গভীর ভাবনায় চোখ উছলানো জলে বাকহারা ইলিয়াস বাবু শিশুটির কাছে অসহায়, জবাবহীন..! সাথে এক সুগভীর আত্মপীড়ন... ■

পরিবর্তন

প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য

সমাজতন্ত্র ভেঙে যাওয়ার ফলে রিপের স্বপ্নভঙ্গ হয়ে যায়। মনে মনে সে প্রবল আঘাত পেয়েছিল। মনের দুঃখে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে গভীর জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে একটা ছোট্ট মন্দিরের মতো জায়গায় চাতালে বসে পড়ে। রাত গভীর হয়। আস্তে আস্তে রিপ ঘুমিয়ে পড়ে। রিপের ঘুম যখন ভাঙে তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে জঙ্গলের বাইরে বেড়িয়ে আসতে চায়, কিছুদূর গিয়ে একটা দিঘি দেখে ওই বনের ভিতরই। তৃষ্ণার্ত রিপ জল পানের জন্য দিঘির কাছে যায়। হঠাৎ সে দিঘির জলে নিজের ছায়া দেখে চমকে ওঠে... এক রাতে এত বয়েস বেড়ে গেল কি করে!

খানিকটা পথ যেতেই সে লোকালয়ের রাস্তা পেল — এ রাস্তা তার বাড়ির দিকেই গিয়েছে। কিন্তু এ কি! রাস্তার দু-ধারের বাড়িগুলি আর নেই, তার বদলে পাঁচতলা, ছয় তোলা সব বাড়ি, কত দোকান! সেই দোকানে প্যাকেটে যে সব জিনিস বিক্রি হচ্ছিল, তা তার অচেনা। রাস্তার ধারে ছোট্ট কাঁচের ঘর, তাতে লোক ঢুকছে আর টাকা গুনতে গুনতে বেড়চ্ছে। রিপ একজনকে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু সে হেসে

চলে গেল। পিছন থেকে একজন বয়স্ক লোক বলল, “ওটা এ.টি.এম. মেশিন, কার্ড ঢোকালেই টাকা বের হয়।” তার পাশেই একটা দোকানে অনেক টিভি – মানে টিভির দোকান। রিপের বাড়িতে সাদা কালো টিভি, এগুলো রঙিন। সেই রঙিন টিভিতে তখনই খবরে দেখাচ্ছে, “ভারতে ক্ষুধার্ত মানুষের বাস, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের চেয়েও বেশি।” ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

কৃত্রিমতা

বাজারী

প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য

নিলয় বিয়ের আগে মেসে থাকত। এখন নতুন সংসার পাতার জন্য একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে। নতুন বউ তৃণা আর তার মা, নিলয় অফিস চলে গেলেই, সংসার সাজানোর কেনাকাটা করতে শপিং মলে গেল। ট্রলি ভর্তি করে জিনিস কেনা হয়েছে।

মা বলল, "হ্যাঁরে আর কিছু বাকি নেই তো?" তৃণা ঝলমলিয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ একটা কলগেট কিনতে হবে, ওতে নুন আছে আর দুটো হারপিক – নীল টয়লেট আর লাল বাথরুমের জন্য। ও হ্যাঁ আর একটা উইমেন্স হরলিকস... বোন ডেনসিটি কম হয়ে যায় না..."

সব কেনা হয়ে গেলে মা বলল, "এবার হয়েছে, চল..." তৃণা তখনই আঙুল দিয়ে দেখাল, "একবার ওই দিকে যাব।" মা অবাক, "সে কি শাড়ি কিনবি! এই তো বিয়েতে এক গাদা শাড়ি পেয়েছিস!" তৃণা বলল, "শাড়ি না, একটা রানী রাসমণি ব্লাউজ কিনব। সিরিয়ালে দেখনি..." ■

মাইক্রো আড্ডা ২০১৯

(বাম ☞) রবীন্দ্র সদনে পি. কে., রাজশ্রী দত্ত আর মালা মুখার্জী...

(বাম ☞) কলকাতার কফি হাউসে স্বাগতা পাঠক, রাজশ্রী দত্ত আর পি. কে. ...

এপিজে আয়োজিত বাংলা সাহিত্য উৎসব ২০১৯ এ পুরস্কার নিচ্ছেন পাণ্ডুলিপির শরণ্যা মুখোপাধ্যায়...

সাহিত্যিক অসিত চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে সত্তরের দশকের সাঁতরাগাছির সাহিত্য চর্চা নিয়ে আলোচনারত পি. কে. ...

(বাম ☞) পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, পি. কে. আর প্রণব কুমার বসু ২০১৯ এর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায়...

(বাম ☞) নর্মদা পরিক্রমার পর প্রত্যাবর্তনের পথে পি. কে., ডঃ অমিত চৌধুরি, কাকাজি (ছদ্মনাম) মুম্বাইএর তিলক নগর স্টেশনে...

প্রবীণ কবি ও বিশিষ্ট চিকিৎসক অরুভট্ট (ছদ্মনাম) শোনাচ্ছেন তাঁর স্বরচিত কবিতা...

(বাম ☞) সাঁতরাগাছিতে অভিজিৎ চ্যাটার্জির সাথে পি. কে. ...

মৎস্য অভিযান

সুভাষ মুখার্জী

আমি ছেলেটা শিশুকাল থেকেই বড় কৌতূহলী। সব ব্যাপার জানা চাই। ছোট থাকতে দাদুর অ্যাকোরিয়ামে একবার ব্যাঙ ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওরা ওই পরিবেশে টিকে থাকতে পারে কিনা সেটা দেখাই উদ্দেশ্য ছিল। তাছাড়া মাছের সাথে তাদের সমানাধিকার স্থাপন করার মহান ইচ্ছেও হয়েছিল হঠাৎ করে। পরের রাম প্যাঁদানিটা অবশ্য অন্য ব্যাপার।

যাই হোক তখন একটু বড় হয়েছি। বন্ধু জুটেছে বেশ কিছু। দলের প্রাত্যহিক মিটিং বসে বিকেলে মাঠের ধারের পরিত্যক্ত হসপিটাল বিল্ডিং এর বারান্দাতে।

একদিনের ঘটনা। কুশীলব হল সঞ্জীব ওরফে সন্টু, পুঁটু (ভালো নাম মনে নেই), ফুলি, নরেশ ওরফে কালা এবং আমি।

সেদিন পৌঁছে দেখি সবাই উপস্থিত।

সন্টু: কিরে এত দেরী করে এলি যে! আমরা তো একটা প্ল্যান ঠিক করে চলেও যাচ্ছিলাম।

আমি: মা যে কি না! যা পড়া দিয়েছিল! ভেবেছিল তাতেই সন্ধে হয়ে যাবে। তাই বলেছিল ওসব হয়ে

গেলেই ছুটি। তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলেছি বলে আর ছাড়তেই চায় না...

পুঁটু: কালকের বিষ্টিতে রফি কাকাদের পুকুর ভেসে গেছে। মাছ ধরতে যাবি তো চল।

আমি: মাছ কি এখনো বসে আছে আমাদের জন্য! সবাই কখন নিয়ে গেছে দেখগে যা। আজ নিশ্চয়ই পাহারাও বসিয়েছে।

পুঁটু: আরে সে সব তো হয়ে গেছে কালকেই। তবে একটা ফাঁদ তৈরী হয়ে গেছে মাছের জন্য।

আমি উৎসাহ দেখাই: কিরকম!

সন্টু: আরে পাশের আনোয়ার কাকার জমিতে জলের জন্য একটা একটা আল কেটে দিয়েছে। ওটাতে পুকুরের জল আসছে।

ফুলি: ওই কাটা আলের ফাঁকে বাঁশের খোল রাখলেই মাছ ঢুকবে ভিতরে। কালা বলছে।

কালা আঁতকে ওঠে: আমি কিছুই বলি নি। শেষে সব কাজ আমার ঘাড়ে চাপালে চলবে না বলে দিলাম।

আমি: বুঝেছি। সেই কাটা বাঁশের টুকরোগুলো দিয়ে মাছ ধরতে চাস। ওর থেকে বেরিয়ে যাবে না?

কালা ব্যাজার মুখে বলে: পুকুর থেকে জলের সাথে এসে একবার ওতে ঢুকলে আর বেরোতে পারবে না।

আমি: ঠিক আছে চল সবাই, রেখে আসি। তবে কাল ভোরে কালাই আনতে যাবি কিন্তু। আমার মাছে দরকারও নেই। অত সকালে বাড়ি থেকে বেরোতেও পারব না।

ফুলি: চল না আজ রেখে তো আসি।

কালা: সেই আমাকেই কাল একা যেতে হবে তো? এটাই ভালো লাগে না।

সবাই চললাম বাঁশের টুকরো আনতে। মোটা বাঁশের নীচের দিকের অদরকারী অংশ। একদিকে গাঁট আরেকদিক খোলা। ওই ভাঙাচোরা ঘরের কোনে একগাদা জমা করা আছে। সেগুলোকেই আলের কাটা মুখের এখানে সেখানে ফিট করে রাখতে হবে।

কালার বাড়ির পরিবেশ একেবারে গ্রাম্য। সে বাকিদের থেকে বেশি স্বাধীনতা পায়। তাই বেশিরভাগ অ্যাডভেন্চারের শেষটা ওই সামাল দেয়। কখনো সখনো ফালতু ঝামেলাও বেচারাকে পোয়াতে হয়।

চারদিক ভেসে জলে কাদায় থিকথিক করছে। কোনোও ভাবে কার্য সম্পন্ন করা হল।

পরেরদিন বিকেল। আমরা সবাই উপস্থিত। কালা বেপাত্তা। নিজেরা বিভিন্ন রকম জল্পনা কল্পনা করার পর শেষে বিষন্নমুখে কালার প্রবেশ।

পুঁটু: গেছলি সকালে?

কালা চুপচাপ ঘাড় হেলায়।

কেলোর কীর্তি

আমি কৌতূহলী: কিরে কটা মাছ পেলি?

সন্টু: কাকিমা খুশি হয়েছে নিশ্চয়ই?

কালা মুখ ভেঙচে ওঠে: হ্যাঁ খুশির চোটে মেরে আমায় বেঁটে করে দিচ্ছিল আরেকটু হলে।

সমবেতভাবে আমাদের বিস্ময় প্রকাশ: সেকিরে কেন? কি হল!

কালা: কি আবার হবে? গিয়ে দেখি মাছ তেমন কিছু পড়েনি। তবে একটা খোল ভর্তি রয়েছে, ভেতরে নড়ছে মাছ। সেটাকে বের করলেই পালাবে, নিয়ে যেতে পারবো না বলে খোল শুদ্দু নিয়ে গেলাম বাড়ি।

ফুলি: কত বড় ছিল?

কালা: এই অ্যাত্তো বড়ো (হাতে করে দেখায় প্রায় দেড় ফুট সাইজ!)

সন্টু: ঢপ দিস না। অত বড় মাছই হয় না এখানে।

কালা: তবে আর বলছি কি? খোলের মুখটা চাপা দিয়ে নিয়ে গেলাম। মাকে বলতে প্রথমে তো খচে গেল। তার পর হাত থেকে নিয়ে রান্নাঘরে উল্টো করে ঝাঁকা দিতেই একটা জলঢোঁড়া কিলবিলিয়ে বেরিয়ে পড়লো!

ফের সমবেত: সাপ! বলিস কি?!

কালা: (রেগে দাঁত কিড়মিড় করে) মুখে বলে বোঝানো যাবে না। করে দেখাই?

সবাই কথা না বাড়িয়ে সুড়সুড় করে যে যার রাস্তা ধরলাম সেদিন...

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে) ■

একটি ফটোগ্রাফ

দীপঙ্কর সরকার

গ্রামের নাম জগন্নাথপুর। বাড়িগুলো একটি হতে আর একটি পাশাপাশি হলেও শহরের মতো ঘিঞ্জি মনে হয় না। রাস্তার দুপাশে আম, জাম কাঁঠালের গাছ। বৈশাখী ঝড়ে আম কুড়ানোর জন্য ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা গাছের নীচে ছুটে আসে।

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলছে ছোট্ট এক নদী; নাম ঘৃলাই। আকারে ছোট হলে কি হবে, বর্ষাকালে ফুলে-ফেঁপে ওঠে এই মৃতপ্রায় নদীটি। বছরে একবার পূর্ণ যৌবনবতী হয়ে 'মৃতপ্রায়' তকমা থেকে নিজেকে পুনরুদ্ধার করে ঘৃলাই। মরা গাঙে একবার জোয়ার আসে; উচ্ছ্বল কলকল শব্দে স্রোতধারা বইতে থাকে। তরঙ্গায়িত ঊর্মিলা নদীটির পায়ে নূপুর পরে নাচতে থাকে। এ যেন পুনর্জীবন লাভের আনন্দে দিগ্বিদিক ছুটে চলা।

সন্ধ্যার পরপরই শান্ত হয়ে যায় পল্লীগ্রাম।

গ্রামে কোন পুরুষ মানুষ থাকে না বললেই চলে; সকলে হাটে যায়। রাত আটটার পর হাটুরেরা ঘরে ফিরতে শুরু করে। আমাদের দুটো মাত্র ঘর। দুটোই মাটির তৈরি। একটাতে বাবা মা থাকেন; আর একটাতে – এক বিছানায় দাদী ও বোন আরেক বিছানায় আমি শুই।

রসদ

তখন ঘরে পাট তোলার মরশুম চলছে। পাটের আঁশ ছড়িয়ে সেগুলোকে রোদে শুকানো শেষে ঘরে তোলা হয়েছে। ঘরে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় দরজার এক পাশে পাট রাখা আছে।

আমি আর বোন ঘরের বারান্দায় বিছানা পেতে হ্যারিকেনের আলোয় সুর করে পড়ছি। রান্নাঘরে মা উনুনে ভাত তুলে দিয়েছেন। পড়তে পড়তে দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসে। দুজনেই ঢুলুঢুলু চোখে পড়তে থাকি। মা রান্না করছেন আর আমাদের সঙ্গে মাঝেমাঝে কথা বলছেন যাতে আমরা ঘুমিয়ে না পড়ি।

বাবা তখনও হাট থেকে বাড়ি ফেরেননি।

মায়ের রান্না প্রায় শেষ ।

ঘরে দাদী শুয়ে আছেন। ঘরের দেয়ালে একটি ফটোগ্রাফ ঝুলানো আছে। দাদা ও দাদীর ছবি। দাদা মারা যাওয়ার পর দাদী মাঝেমধ্যে ছবিটির দিকে তাকান। দাদীর চোখ জলে ভরে যায়। আমরা সে কান্নার অর্থ বুঝি না। দাদীকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন – 'বড় হ তখন বুঝবি'।

মা আমার হাতে মাটির প্রদীপ ধরিয়ে দিয়ে দাদীকে ভাত খাওয়ার জন্য ডাকতে বললেন। আমি দাদীকে ডাকার জন্য ঘরে গেলাম।

দাদী বিছানা ছেড়ে খেতে এলেন। আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। কিছুক্ষণ পর টিনের চালের ফাঁকে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে; দরজার ফাঁকে ঘরটি আলোকিত দেখাচ্ছে। দৌড়ে ঘরের দরজা খুলে দেখলাম দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

রসদ

পাটগুলো পুড়ছে। তাড়াতাড়ি করে টিউবওয়েল থেকে পানি আনলাম। মা কি করবেন বুঝতে পারছেন না। ইতোমধ্যে প্রতিবেশীরা ছুটে এসেছেন। সবাই মিলে আগুনে পানি ঢাললাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিভে গেল। এক ধরণের পোড়া পোড়া গন্ধ নাকে আসছে। আমার হাতে আগুনের আঁচ লেগেছে। ঘরের দেয়ালে দাদা দাদীর যে ফটোগ্রাফটা ছিল ওটাকে বাঁচাতে গিয়ে আমার হাতের এই অবস্থা।

ফটোগ্রাফটির কিছু হয়নি দেখে দাদী আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলেন – আর বললেন, 'তোর দাদার এই একটিই স্মৃতি অক্ষত আছে; সেটাও আজ হারিয়ে যেত তুই না থাকলে। বুকে আয় দাদুভাই।'

আমার হাতের মাটির প্রদীপ থেকে পাটে আগুন লেগে যায়। সেখান থেকে পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

ফটোগ্রাফটা বাঁচাতে পেরেছিলাম বলে খুব ভাল লেগেছিল। দাদীও গত হয়েছেন কয়েক বছর হল, তবে ফটোগ্রাফটা আমি আমার ঘরে খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি। এমন শ্বাসরুদ্ধকর রাতের কথা আমি কোনদিনও ভুলতে পারি না... ■

পরাজয়

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

আমি রিনা বোস বাগচী। সুধীর বাগচীর কাছে আমি তো সত্যিই হেরে গেলাম। বাড়ির এক মেয়ে, ছোট থেকেই চাইলেই পাওয়ার অভ্যাস। কিশোরী হয়েই বুঝলাম আমার শরীরের ভাঁজগুল বড় উগ্র। পাড়ার অনেক দাদাই আমায় লাইন মারত। কিন্তু সুধীরদাকে আমার খুব ভাল লাগত – যেমন পড়াশোনায় তেমনি খেলাধুলায়। অথচ সুধীরদা আমাকে পাত্তাই দিতনা।

ওকে জ্বালাবার জন্যই তো মাখামাখি শুরু করলাম বিমলের সাথে, সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হতেই, বিমলরা আমাদের পাড়া থেকে চলে গেল। তারপর বুঝলাম, আমি অন্তঃস্বত্ত্বা।

বিমল আর এলোনা। আমার ফেরার পথ বন্ধ, অথচ তা নিয়ে আমার চেয়ে বাবা মা বেশি চিন্তিত। হঠাৎ বাবা জানালেন সুধীরদা আমাকে বিয়ে করবে।

বিয়ের পর আমার কন্যা জন্ম নিল। সে সুধীর বাগচীকেই বাবা ডাকল। আজ সুধীর তার সমস্ত দায়িত্বই পালন করে চিরতরে বিদায় নিল। অথচ আমার থেকে কোনদিনও তার বংশধর দাবী করল না... ■

বেড়ি

প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (পি.কে.)

কাল রাতে ফেসবুকে পড়লাম নাসিরুদ্দিনের একটা বই প্রকাশিত হয়েছে। ও বাংলা দেশের ছেলে, বেশ লেখে। ফেসবুকেতো প্রায়ই পড়ি ওর লেখাগুলো। তবে, বই বেরোবে বলে ও আগে জানায়নি। যা হোক, তাতে ভালই হয়েছে। বেশ একটা সারপ্রাইস পাওয়া গেল। কিন্তু নাসিরুদ্দিনের বই বেরল, শুনেই তা হাতে নিতে বড় সাধ হল, ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে তো সে উপায় নেই, তাই যথারীতি ক্ষুণ্ণ মনেই নিদ্রাদেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

ক'দিন আগে নাসিরুদ্দিন লিখেছিল – বাংলাদেশ ভারতের সীমান্ত বরাবর ইছামতী নদীপথে ও ভ্রমণ করছিল। এদিকে আসতে হলে পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদির প্রয়োজন... তাই আর আসা হলনা। সেই কথাটাই মাথায় ঘুরছিল।

মাঝরাতে বোধহয় ঘুমটা একটু পাতলা হয়ে গিয়েছিল! আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম – ইছামতী নদীর মাঝ-বরাবর ওর বইটা হাতে নিয়ে নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে, নাসিরুদ্দিন আমায় ডাকছে। ভারতের দিকের নদীর জল কুলুকুলু শব্দে বাংলাদেশের দিকের নদীর জলের সাথে মিলে মিশে

খোয়াব

একাকার হয়ে হালকা ঢেউ তুলে ঘুরপাক খাচ্ছে। নাসিরুদ্দিন ভারতের দিকে হাত বাড়িয়েছে – ওর বইটা আমার হাতে তুলে দেবার জন্য। আমিও একটা নৌকা চড়ে ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ওর বইটা নেব বলে। আমাদের নৌকাগুলো প্রায় একে অপরকে ছুঁয়ে ফেলেছে... ইছামতীর বুকে দাঁড়িয়ে, সোল্লাসে উদার্ত কণ্ঠে, দিক্বিদিক মুখরিত করে নাসিরুদ্দিন ওর আবাহনী কবিতা পাঠ করছে...

এমন সময় হঠাৎ কোত্থেকে যেন হাওয়ায় এক নাগাড়ে ভেসে আসতে লাগল হুইসেলের শব্দ। আমার ঘুম ভেঙে গেল, ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম। ভাগ্যিস আমাদের মাঝিরা নৌকার মোড় ঘুড়িয়ে ফেলেছিল সময়মত! কিন্তু ততক্ষণে নাসিরুদ্দিনের কবিতার অনেকগুলো লাইন আমি শুনে নিয়েছি। হাওয়ার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ি? ■